

বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে চালু হোক এ কোর্স

অধ্যাপক ড. মো. বজলুর
রহমান মোল্যা



আজকের তরুণরাই আমাদের ভবিষ্যৎ। কিন্তু তাদের অনেকেই আজ ফেসবুক ও নানা কারণে দিকভ্রান্ত, উদ্যমহীন। শিক্ষকরাও নানা মতাদর্শে বিভক্ত বলে ছাত্ররা তাদের আদর্শ মনে করছে না। তাই আমার অনুরোধ—কোয়ান্টামের এ কার্যক্রম বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে চালু করা হোক। আমি আমার বিশ্ববিদ্যালয়ে আমন্ত্রণ জানিয়ে রাখলাম।

আমি আমার মেয়েকে সাথে নিয়ে এ কোর্সে এসেছি। যদিও কোয়ান্টামের সাথে আমার পরিচয় বহু আগে। ১৯৯৬ সালে রাজশাহীর একটি পুরনো বইয়ের দোকান থেকে খুব অল্প টাকায় আমি সাফল্যের চাবিকাঠি কোয়ান্টাম মেথড বইটি কিনেছিলাম। বইটি এখনো আছে আমার কাছে। সে-সময় আমি কিছুটা হতাশাগ্রস্ত ছিলাম। বই পড়ে আমি শিখিলায়নের অনুশীলন শুরু করি। অভিজ্ঞতা থেকে বলছি—শিখিলায়ন যত ভালো হবে, একজন মানুষ জীবনে তত সফল হবেন।

পরের বছরই আমি বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হই। ক্লাস শুরুর দুমাস পরে গিয়ে ভর্তি হলেও পরবর্তী সবগুলো পরীক্ষায় আমি রেকর্ড পরিমাণ নম্বর নিয়ে প্রথম হই। অথচ এর আগে আমি কখনো পরীক্ষায় প্রথম হই নি। এরপর বৃত্তি নিয়ে বিদেশে গিয়েছিলাম, হয়েছি। আমার গবেষণা প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে বিশ্বখ্যাত জার্নালগুলোতে। আমি যা চেয়েছিলাম, সবই পেয়েছি। এসব অর্জনের নেপথ্যে কোয়ান্টাম চর্চার একটি বড় ভূমিকা রয়েছে। তাই কোর্সের এ চার দিন গুরুত্বপূর্ণ প্রতিটা কথার সাথে আমি একাত্মতা অনুভব করেছি।

[বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের পোষ্ট্রি বিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক এবং ইলিশ ও গ্ল্যাক বেঙ্গল ছাগলের পূর্ণাঙ্গ জিনোম উন্মোচনকারী দলের অন্যতম গবেষক ড. মো. বজলুর রহমান মোল্যা কোয়ান্টাম মেথড কোর্স ৪৬২ ব্যাচের প্রত্যয়ে একথা বলেন।]



কোয়ান্টাম বুলেটিন

অক্টোবর ২০১৯

বিশেষ আলোচনায় গুরুজী ঋণ, কিস্তি ও ক্রেডিট কার্ডের অভিশাপ থেকে বাঁচুন

ঋণ একটি অভিশাপ—হোক তা ব্যক্তির জীবনে বা জাতির জীবনে। হাজার বছর ধরে মানুষকে দাসে পরিণত করে রাখার জন্যে শোষকদের অব্যর্থ হাতিয়ার ছিল এই ঋণ। কারণ ঋণ ও কিস্তির চাপ মানুষকে হয় দাসে পরিণত করে, নয়তো সে হয়ে ওঠে দুর্বৃত্ত। এজন্যেই নবীজী (স) সবসময় ঋণ থেকে পরিত্রাণ চেয়েছেন। এর পাশাপাশি এ যুগে সাম্রাজ্যবাদী শোষকদের আরেকটি সুচতুর ফাঁদ হলো ক্রেডিট কার্ড। যা বাকিতে কেনার অভ্যাস করিয়ে একজন মানুষকে দীর্ঘমেয়াদে ঋণগ্রস্ত করে

তোলারই একটি পরিকল্পিত প্রক্রিয়া। তাই সচেতন হোন। ঋণ, কিস্তি ও ক্রেডিট কার্ডের গজব থেকে নিজে বাঁচুন। বাঁচান আপনার পরিবারকে।

গত ২৮
আগস্ট কোয়ান্টাম
প্রো-মাস্টারদের
নিয়ে আয়োজিত

একটি অনুষ্ঠানে একথা বলেন গুরুজী শহীদ আল বোখারী মহাজ্ঞাতক। ঋণ ও এর বহুমুখী অপপ্রভাব নিয়ে তথ্যপ্রমাণসহ বিস্তারিত আলোচনা করেন তিনি।

গুরুজী বলেন, নবীজীর (স) একটি প্রার্থনা ছিল—আউযুবিল্লাহি মিনাল কুফরি ওয়াদ্দাইন। যার মর্মার্থ হলো, ‘আমি কুফর (সত্য অস্বীকার) ও ঋণ থেকে আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা করছি’ (আবু সাঈদ খুদরী, নিসাদি শরীফ)। অর্থাৎ সত্য অস্বীকার করে কাফের হওয়া আর ঋণগ্রস্ত হওয়াকে নবীজী (স) একইরকম পাপ বলে গণ্য করেছেন।

সনাতন হিন্দু, বৌদ্ধ এবং খ্রিষ্টান ধর্মেও ঋণকে একটি জঘন্য পাপাচার রূপে অভিহিত করা হয়েছে এবং ঋণ

যে মানুষের জীবনকে দুর্দশাগ্রস্ত করে তোলে, সেটা বিভিন্নভাবে বলা হয়েছে।

গুরুজী আরো বলেন, ঋণ সর্বযুগেই ব্যবহৃত হয়েছে একজন মানুষ কিংবা একটি নির্দিষ্ট জনগোষ্ঠীকে দাস বানিয়ে রাখার ফাঁদ হিসেবে। ঋণ মানুষের সম্ভাবনাকে নষ্ট করে দেয়। ধ্বংস করে তার নৈতিক চরিত্র ও দৃঢ়তাকে। পাঁচ হাজার বছরের ইতিহাসে দেখা যায়—প্রতিটি জাতি পতনের আগে ঋণ জর্জরিত ছিল। অভিজ্ঞতায় দেখেছি, যে পরিবারে একবার ঋণ ঢোকে, সে পরিবারের সুখ-শান্তি নষ্ট হয়ে যায়।

অতিসম্প্রতি আমাদের দেশেও শুরু হয়েছে এই ঋণ আগ্রাসন। পশ্চিমা ও পুঁজিবাদী সাম্রাজ্যবাদ আমাদের সামগ্রিক অগ্রযাত্রাকে থামিয়ে দিতে এখন নেমেছে আমাদেরকে ঋণদাসে পরিণত করার সুপারিকল্পিত

চক্রান্ত নিয়ে—যার অন্যতম অনুষঙ্গ হলো ক্রেডিট কার্ড। অর্থাৎ আপনি যেন উপার্জন করার আগেই ব্যয় করতে অভ্যস্ত হয়ে পড়েন এবং একসময় নিজের শান্তি, সম্মান, নৈতিকতা ও মনোদৈহিক সুস্থতা হারিয়ে বসেন। কারণ ঋণগ্রস্ত জীবন দাসের জীবন। বলা যায়, আজ দেশের একশ্রেণির মানুষের মধ্যে যে সর্বগ্রাসী নৈতিক অধঃপতন—তার অন্যতম মূল কারণ হলো ঋণ, বিশেষত ক্ষুদ্রঋণ। এ কথাই আমার বলে আসছি গত দুই যুগ ধরে।

অতএব সুদযুক্ত সব ধরনের ঋণ নেয়া এবং সেইসাথে ক্রেডিট কার্ড ব্যবহার, ক্রেডিট কার্ডের কো-হোল্ডার ও গ্যারান্টার হওয়া থেকে পুরোপুরি বিরত থাকুন।

সচেতন হোন

চিনি স্বাদে মিষ্টি কিন্তু বিষ

চিনির আরেক নাম হোয়াইট পয়জন বা সাদা বিষ। অতিরিক্ত চিনি গ্রহণের ফলে বিশ্বজুড়ে বাড়ছে নানা দুরারোগ্য ব্যাধি। শুরু থেকেই কোয়ান্টাম পরিবার এ ব্যাপারে সচেতন। চিনি বর্জনের প্রাথমিক উদ্যোগ হিসেবে ফাউন্ডেশনের সেন্টার-শাখা-সেলে চা পানে এখন আর চিনির ব্যবস্থা রাখা হচ্ছে না।

আপনিও সচেতন হোন। চিনি পরিহার করুন। যে-কোনো সাফল্য উদযাপন ও অতিথি আপ্যায়নে মিষ্টির পরিবর্তে পরিবেশন করুন খেজুর ও দেশি ফল।

জানুন স্বাস্থ্যঘাতী চিনির কুফল :

- ভাত রুটি ফলমূল সবজি—এসবের রয়েছে শরীরের জন্যে প্রয়োজনীয় চিনি। এ খাবারগুলো হজম প্রক্রিয়ায় গ্লুকোজে পরিণত হয়, যা থেকে আমরা শক্তি পাই। কিন্তু সাদা চিনি হলো সুক্রোজ, যা গ্লুকোজে পরিণত না হয়ে সরাসরি রক্তে মিশে যায়। মানবদেহের মেটাবলিক সিস্টেম প্রক্রিয়াজাত চিনি (রিফাইন্ড সুগার) গ্রহণের অনুকূল নয়, বরং চর্বি (ট্রাইগ্লিসারাইড) হিসেবে শরীরে জমতে থাকে এই চিনি।
- যত চিনি খাবেন তত বাড়বে হৃদরোগের ঝুঁকি—একথা বলেছেন হার্ভার্ড মেডিকেল স্কুলের প্রফেসর ফ্রাঙ্ক হো। অতিরিক্ত চিনি গ্রহণে ক্যান্সারের ঝুঁকিও বাড়ে। বিশেষ করে ব্রেস্ট ও কোলন ক্যান্সার।
- বয়সের তুলনায় বুড়ো দেখায়। তুকে ভাঁজ পড়ে, ব্রণ হয়।
- ডায়াবেটিস, ফ্যাটি লিভার, দাঁত-ক্ষয় ও শরীরে ইউরিক এসিড বৃদ্ধির অন্যতম কারণ চিনি।
- নিকোটিনের মতোই আসক্তিকর। চিনি গ্রহণে ব্রেনে ডোপামিন ও ওপিএম-হাস পায়, ফলে অবসাদ ও বিষণ্ণতা এসে ভর করে।

তথ্যসূত্র : হার্ভার্ড হেলথ পাবলিশিং,
দ্য ডায়াবেটিস কাউন্সিল ডটকম

কোয়ান্টাম মেথড

৪৬৩ তম কোর্স

১১, ১২, ১৩ ও ১৪ অক্টোবর
(শুক্র, শনি, রবি ও সোমবার)

৪৬৪ তম কোর্স

১৫, ১৬, ১৭ ও ১৮ নভেম্বর
(শুক্র, শনি, রবি ও সোমবার)

স্থান : ইনস্টিটিউশন অব ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ার্স
বাংলাদেশ (আইডিইবি), কাকরাইল, ঢাকা

সুস্থ দেহ প্রশান্ত মন কর্মব্যস্ত সুখী জীবন

কর্মই মানুষকে উজ্জীবিত রাখে

বাবু সুকুমার চক্রবর্তী



২৫ বছর আগের কথা। তখন আমি বিশ্ব ব্যাংকের একটি প্রজেক্টে ন্যাশনাল ট্রেনিং কনসালটেন্ট হিসেবে কাজ করছি। সে-সময় একদিন আমার হার্ট অ্যাটাক হলো। কলকাতার বিএম বিড়লা হার্ট রিসার্চ সেন্টারে ডা. দেবী শেঠী আমার বাইপাস অপারেশন করলেন। কিন্তু সুস্থ হলাম না, বরং দিন দিন স্বাস্থ্যের অবনতি হচ্ছিল। ৭১ থেকে আমার ওজন কমে হলো ৬০ কেজি।

আবার গেলাম ফলো-আপের জন্যে। পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে ডাক্তার বললেন, ‘আপনার হার্ট তো ঠিক আছে। কিন্তু অসুখটা আপনার মনে গেঁথে গেছে। তাই শুধু ওষুধে কাজ হবে না। আপনি মেডিটেশন করুন।’

নিরাময়ের ক্ষেত্রে মেডিটেশনের কার্যকারিতা তখনো আমার জানা ছিল না। আর মেডিটেশন শিখবই-বা কোথায়? ডাক্তার বললেন, ‘ঢাকায় শান্তিনগরে একটি প্রতিষ্ঠান আছে, সেখানে মেডিটেশন শিখতে পারেন।’ আমি অবাক! শান্তিনগরের সোনালী ব্যাংক স্টাফ কলেজে আমি ১০ বছর অধ্যক্ষ ছিলাম, কিন্তু ওখানে মেডিটেশন কোথায় শেখানো হয়? ডাক্তার বললেন, ‘সেখানে মহাজাতক নামে একজন আছেন, তিনিই মেডিটেশন প্রশিক্ষণ দেন।’ কিন্তু গুরুজী মহাজাতককে তখনো আমি এক্সট্রলজার হিসেবেই চিনতাম।

দেশে ফিরে প্রথমই গুরুজীর সাথে দেখা করলাম। তিনি আমাকে চিনতে পারলেন। বললেন, ‘সুকুমার বাবু! কী হয়েছে আপনার? রাজপুত্রের মতো চেহারার এ কী হাল?’ তাকে সব খুলে বললাম। পরের মাসেই কোয়ান্টাম মেথড কোর্সে অংশ নিতে বললেন তিনি আমাকে। আমি বললাম, ‘দিনে ১০ ঘণ্টা করে এই কোর্স, আমি তো এতক্ষণ বসতে পারব না! দুঘণ্টার বেশি কোথাও বসার মতো শারীরিক অবস্থা আমার নেই। খুব অস্থির লাগে। মনে হয় এখনই মারা যাব।’

গুরুজী আমাকে আশ্বস্ত করলেন, ‘কোনো অসুবিধা নেই। বসতে না পারলে আপনার জন্যে শোয়ার ব্যবস্থা রাখব। তবুও আপনি আসুন। মেডিটেশন করুন। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, আপনি সুস্থ হয়ে যাবেন।’ তার সেদিনের আন্তরিক কথাগুলো আমাকে মুগ্ধ করেছিল, যা এখনো মনে পড়ে।

কোয়ান্টাম মেথড কোর্সের ৬৯ তম ব্যাচে অংশ নিলাম। মেডিটেশন করলাম। মনে সাহস পেলাম। আমি বসেই কোর্স করেছিলাম, শুতে হয় নি। আর বাইপাস অপারেশনের পর থেকেই আমার ভেতরে সবসময় এক ধরনের ভীতি কাজ করত। মনে হতো, আর সুস্থ হবো না। কিন্তু মেডিটেশন চর্চার পর থেকে এখন পর্যন্ত রোগ-শোক নিয়ে আমি আর ভয় পাই না।

কোর্স করার ২৩ বছর হলো। এখনো আমি মেডিটেশন চর্চা করি। নিয়মিত বৈজ্ঞানিক খাদ্যাভ্যাস অনুসরণ করি। তৈলাক্ত খাবার একদম বর্জন করেছি, নিম্নস্তরে

ব্যার্কিং এন্ড ট্রেনিং কনসালটেন্ট বাবু সুকুমার চক্রবর্তী। ১৯৯৭ সালে কোয়ান্টাম মেথড কোর্সে অংশ নেন। ২৩ সেপ্টেম্বর ২০১৯ ছিল তার ৮৫ তম জন্মদিন। সেদিন কোয়ান্টাম পরিবারের বর্ষীয়ান এই সদস্য প্রধান অতিথি হিসেবে আমন্ত্রিত হন মুক্ত আলোচনার ৯২ তম আয়োজনে। ‘কর্মবাস্তু সুখী জীবন’ বিষয়ে সেখানে তিনি যে আলোচনা করেন, নিম্নোক্ত নিবন্ধটি তারই নির্বাচিত অংশের অনুলিখন।

গেলেও আমি ওসব খাবার খাই না। এই বয়সে এসে দেখি-আমার বন্ধুদের অনেকেই পৃথিবী ছেড়ে চলে গেছেন, আর যারা আছেন তারা মনের দিক থেকে একদম বুড়ো হয়ে গেছেন। কিন্তু শ্রুতির কৃপায় আমি প্রাণবন্ত আছি। এর অন্যতম কারণ আমার সুস্থ জীবনাচার।

আমি সবসময় আনন্দে থাকার চেষ্টা করি। তাই তো আমি সুযোগ পেলেই সত্যজিৎ রায়ের গানটি গাই-আহা কী আনন্দ আকাশে বাতাসে...। কখনো মন খারাপ হলে বলি-আনন্দ! আনন্দ! আনন্দ! এই শব্দটির একটি ইতিবাচক শক্তি আছে। দুঃখকে সে নিমেষেই ভুলিয়ে দেয়।

আমার অপারেশনের পর ডা. দেবী শেঠী সুস্থতার জন্যে আমাকে আনন্দে থাকার কথা বলেছিলেন। সনাতন ধর্মে বলা হয়, ওম শান্তি! এই ‘শান্তি’ শব্দটিরও আলাদা একটি শক্তি রয়েছে। এর উচ্চারণেও দুঃখ-বেদনা চলে যায়। আনন্দ আর শান্তি পরস্পর সম্পর্কযুক্ত। তাই আনন্দের গান আমার বরাবরই খুব প্রিয়। শুদ্ধ সঙ্গীতের মাঝে আমি প্রভুকে খুঁজে পাই। তাঁর করুণাকে অনুভব করি। বিশেষত এই রবীন্দ্রসঙ্গীতটি যখন শুনি-আনন্দলোকে মঙ্গলালোকে বিরাজ সত্যসুন্দর ॥ মহিমা তব উদ্ভাসিত মহাগগনমাঝে...।

এ ধরনের গানগুলো মানুষকে প্রশান্ত করে। এখানে সত্যসুন্দর বলতে ঈশ্বরকে বোঝানো হয়েছে। তিনি পরমানন্দময়। তাঁর বন্দনা করলে আমরা শান্তিতে থাকি, নির্ভয়ে থাকি। বর্তমানে মিউজিক থেরাপি নামে বেশ কিছু চিকিৎসা বের হয়েছে। শুদ্ধ সঙ্গীতের মূর্ছনায় রোগীরা আরোগ্য লাভ করছে, সংবাদপত্রে এরকম অনেক প্রতিবেদন আমরা দেখতে পাই।

সঙ্গীত মানুষকে কতটা প্রশান্ত করতে পারে বিখ্যাত সঙ্গীতজ্ঞ তানসেন তার প্রমাণ। সম্রাটের যখন মন খারাপ থাকত বা অস্থির থাকতেন তখন তানসেন তার সুরের শক্তিতে সম্রাটকে প্রশান্ত করে তুলতেন। কথিত আছে, তানসেনের রাগ মেঘমল্লারের ঝংকারে বৃষ্টি নামত।

বই পড়ার মাঝেও আমি আনন্দ খুঁজে পাই। জনপ্রিয় লেখক হুমায়ূন আহমেদ তার ‘অমরত্ব’ নিবন্ধে বলেছেন, জীবন আমাদের কাছে কতটা প্রিয়। দীর্ঘ আয়ু লাভের পরও মানুষ আরো বহুদিন বেঁচে থাকতে চায়। মরতে চায় না। পৃথিবীর বড় বড় ক্ষমতাধর ব্যক্তিরাও মরতে চায় নি। অমৃতের সন্ধানে তারা অনেক অর্থ ও শক্তি ব্যয় করেছে। কিন্তু মৃত্যুর কোনো ওষুধ কেউ আবিষ্কার করতে পারে নি। তাই বেঁচে থাকাটা আনন্দময় হওয়া প্রয়োজন।

এই বাংলায় দীর্ঘায়ু পেয়েছিলেন বাবা লোকনাথ ব্রহ্মচারী। তিনি ১৬০ বছর বেঁচেছিলেন। তিনি প্রায়ই গোমুখাসনে বসে থাকতেন। এটি এমন একটি যোগাসন যেখানে মেরুদণ্ড সোজা রাখতে হয়। আর মেরুদণ্ড সোজা মানে তারণ্যকে দীর্ঘস্থায়ী করা। আমিও আসনটি নিয়মিত চর্চা করি। যোগচর্চা এবং মেডিটেশনই পারে তারণ্যকে ধরে রাখতে।

আর কেউ যদি সুস্বাস্থ্য অর্জন করতে চায়, অবশ্যই তার ঘুম ভালো হতে হবে। আমি এখন পর্যন্ত কোনো ঘুমের ওষুধ খাই না। রাতে ঘুমানোর আগে আমি একটি অটোসাজেশন চর্চা করি-Live Long, Happy Strong, Grow Young. কোয়ান্টাম মেথড বই থেকে এটি শিখেছিলাম। আর সারাদিনে ‘আমি ভালো আছি’ অটোসাজেশনটি বলি ২০/২৫ বার।

বর্তমানে আমি বাংলাদেশ ব্যাংকের ফিন্যান্সিয়াল সেক্টর রিফর্ম প্রজেক্টের ন্যাশনাল ট্রেনিং কনসালটেন্ট হিসেবে দায়িত্ব পালন করছি। এখনো টানা দুঘণ্টা ক্লাস নিই। সবমিলিয়ে আমি যাপন করছি কর্মবাস্তু সুখী জীবন।

আমাদের তরুণদের উদ্দেশ্যে বলি-তোমরা সময়কে শ্রদ্ধা করতে শেখো। সময়কে কখনো বৃথা যেতে দেবে না। ধরা যাক, একজন তরুণ ২৭ বছর বয়সে পেশাজীবনে প্রবেশ করে ৫৯ বছর বয়সে অবসরে গেল। মাঝখানের এই ৩২ বছরে তার লক্ষ্য হওয়া উচিত-পেশায় সর্বোচ্চ পর্যায়ে যাওয়া। কিন্তু সে যদি তার সময়কে ভালো কাজে ব্যয় না করে তাহলে পেশা কিংবা ব্যক্তিজীবনের কাক্ষিক্ষিত পর্যায়ে সে কখনো পৌঁছতে পারবে না।

তাই আমার কথা হলো, তোমাদের প্রতিদিনের কর্মকাণ্ড ঠিকমতো পর্যালোচনা করলে দেখবে-দিনের অনেকটা সময় কিন্তু অপচয় হয়ে যায়। বিশেষ করে কেউ যদি ইন্ডিয়ট বক্স অর্থাৎ টেলিভিশন বা স্ক্রিনের সামনে ঘণ্টার পর ঘণ্টা বসে থাকে, তাহলে তো কথাই নেই। এ সময়টা তুমি জ্ঞানচর্চা করো, কাজ করো। মনে রেখো-কর্মই মানুষকে উজ্জীবিত করে আর অকর্ম করে সর্বনাশ।

সাবধান! ঋণদাস হবেন না

দৃশ্যপট ১ : কয়েকজন তরুণ মিলে মুরগির খামার করল। ব্যবসা ভালোই চলছিল। পরিচিত একজন উদ্বুদ্ধ করল ব্যাংক থেকে ব্যবসা খাতে ঋণ (সিসি লোন) নিতে। ঋণের টাকায় খামার আরো বড় হলো। কিন্তু আকস্মিক বার্ড ফ্লুর আক্রমণে ব্যবসা ক্ষতিগ্রস্ত হলো ভীষণভাবে। অন্যদিকে কিস্তি পরিশোধের চাপ। সময়মতো কিস্তি শোধ করতে না পারায় আসতে থাকল ব্যাংকের চিঠি, উকিল নোটিশ। এ বিপদ থেকে মুক্তি পেতে তারা খামারের জমি সস্তা দামে বিক্রি করে দিল। এখানেই শেষ নয়, ঋণের বাকি অংশ শোধ করতে প্রত্যেকে দেউলিয়া হয়ে গেল।

দৃশ্যপট ২ : বিয়ে উপলক্ষে মোটা অঙ্কের ঋণ নেয় এক ব্যাংকার। দ্রুত ঋণশোধের আশায় বিয়ের খরচের পর বাকি টাকা শেয়ার বাজারে বিনিয়োগ করে। কিন্তু শেয়ার ব্যবসায় ধস নামার পর আরো ঋণের জন্যে দ্বারস্থ হয় অন্য ব্যাংকের। সেই ঋণের কিস্তি চালাতে বন্ধুবান্ধব ও আত্মীয়দের কাছে একের পর এক দেনায় জড়িয়ে পড়ল। এদিকে সংসারের খরচ সামলাতে না পারায় পরিবারে প্রতিদিন অশান্তি।

দৃশ্যপট ৩ : বিত্তবান এক ব্যক্তির বাড়িতে প্রায়ই হতো ভোজ অনুষ্ঠান। আত্মীয়স্বজন খোশমেজাজে এতে শরিক হতো। বিলাসবহুল জীবন ও উচ্চপদস্থদের সাথে গুঁঠাবসার জন্যে তার পরিবার-পরিজন গর্ব করত। এই রাজসিক জীবনের পেছনে ছিল কোটি টাকার ব্যাংক ঋণ। ঋণশোধ করতে না পারায় তার যাবতীয় সম্পত্তি একসময় জব্দ করা হলো। পাওনাদারদের তাগাদায় লজ্জাকর জীবন কাটিছিল তার। হঠাৎ তার মৃত্যু হলো, কারণ ঋণের চাপ ও অপদস্থ হওয়ার ভয়। কুলখানিতে গ্রামের কয়েকজন ছাড়া কোনো আত্মীয়কে দেখা যায় নি। আত্মীয়রা তার পরিচয় দিতেও লজ্জাবোধ করে।

উল্লিখিত প্রতিটি ঘটনাই সমাজের বাস্তব চিত্র, দেশে-বিদেশে এমন উদাহরণ অগণিত। ঋণ, কিস্তি ও ক্রেডিট কার্ড বর্তমানে এভাবেই পরিণত হয়েছে মরণফাঁদে। বিশ্বজুড়ে সর্বস্বান্ত হচ্ছে সাধারণ মানুষ।

ঋণগ্রস্ত মানুষের পরিণতি : ঋণদাস বা দুর্বৃত্ত

ব্রিটেনের বৃহত্তম সামাজিক গবেষণা প্রতিষ্ঠান ন্যাশনাল সেন্টার ফর সোশ্যাল রিসার্চের সমীক্ষা অনুযায়ী, ইংল্যান্ডে প্রতি বছর এক লাখেরও বেশি মানুষ ঋণের ধকল সহ্য করতে না পেরে আত্মহত্যার চেষ্টা করে।

আমেরিকায় বিবাহ-বিচ্ছেদের অন্যতম প্রধান কারণ ঋণ। ঋণকে মার্কিন সমাজবিজ্ঞানীরা তাই বলছেন, সম্পর্কের ঘাতক। পাশ্চাত্যে ক্রেডিট কার্ডধারী প্রত্যেকের পরিচয়-সে একজন ঋণদাস।

জাতীয় জীবনে নতুন আত্মাশান : ঋণ

আমাদের দেশে নতুন আত্মাশানের নাম ঋণ। ২০১৫ সালে বোস্টন কনসাল্টিং গ্রুপ (বিসিজি) প্রকাশিত একটি প্রতিবেদন হচ্ছে, The surging consumer market nobody saw coming. যার মূল বিষয় ছিল, বাংলাদেশে কীভাবে ক্রেডিট কার্ড ব্যবহার অর্থাৎ বাকিতে কেনার অভ্যাসকে জনপ্রিয় করা যায়।

বোস্টন গ্রুপের ভাষ্য, ২০২৫ সালে টাকার মধ্যবিত্ত ও বিত্তবান জনগোষ্ঠীর আকার হবে বর্তমানের

দ্বিগুণ। রাজশাহী ও বরিশালে তিন গুণ এবং খুলনায় হবে বর্তমানের ছয় গুণ। কেননা ভারত চীন ইন্দোনেশিয়ার মতো উদীয়মান ধনী দেশগুলোর চেয়ে বাংলাদেশে আশাবাদী মানুষের সংখ্যা অনেক বেশি। সেইসাথে অধিকাংশ বাংলাদেশি খরচ ও ঋণশোধের ব্যাপারেও সচেতন। কিন্তু মধ্যবিত্ত ও বিত্তবান ক্রেতা-ভোক্তাদের মধ্যে ক্রেডিট কার্ড ব্যবহার করে মাত্র ৬% আর এদের মধ্যে গৃহঋণ নিয়েছে মাত্র ৩%। ২০১৬ সালে বোস্টন গ্রুপের একটি রিপোর্ট হচ্ছে, This is how consumers turn into debt slaves অর্থাৎ কীভাবে ভোক্তারা ঋণদাসে পরিণত হয়।

আমাদের দেশে এই দাসত্বের প্রসারে সবচেয়ে বড় ভূমিকা রেখেছে ক্ষুদ্রঋণ প্রচলনকারীরা। এরই ফলাফল-আমাদের জাতীয় জীবনে নানা ধরনের নৈতিক অবক্ষয়। সমীকরণটা খুব সহজ, একজন ঋণগ্রস্ত মানুষ মিথ্যা বলে আর যে মিথ্যা বলে সে যে-কোনো অপরাধে জড়িয়ে পড়ে খুব সহজে। ঋণের চাপে সে আর সং থাকতে পারে না।

ক্রেডিট কার্ড : শুভঙ্করের ফাঁকি

ক্রেডিট কার্ড কোম্পানিগুলোর মূল লক্ষ্য হচ্ছে, বিলাসী পণ্যসামগ্রী বাকিতে কিনতে অভ্যস্ত করা। কারণ নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যগুলোর জন্যে কাউকে ঋণের দ্বারস্থ হতে হয় না। বিলাসী ভোগ্যপণ্য (স্মার্ট টিভি, হোম থিয়েটার, এসি, ওয়াশিং মেশিন, স্মার্ট ডোর সিকিউরিটি সিস্টেম, গেমিং ল্যাপটপ) কেনার সামর্থ্য না থাকলেও ক্রেডিট কার্ডে তা কিনে ফেলা কয়েক মুহূর্তের বিষয়।

একটি ওয়াশিং মেশিনের দাম যদি হয় ৫০ হাজার টাকা, আপনার উপার্জন যা-ই হোক, মিনিমাম এমআউন্ট পে-এবল পলিসিতে ৫% সুদে আপনি তা কিনে ফেললেন। এ ঋণ শোধ হতে সময় লাগবে প্রায় ১৮ বছর এবং এই সময়ে আপনাকে শোধ করতে হবে দুই লক্ষাধিক টাকা।

বর্তমানে ক্রেডিট কার্ডের প্রতি তরুণদের তীব্র আকর্ষণ লক্ষণীয়। পকেটে একাধিক ক্রেডিট কার্ড থাকাকে তারা স্ট্যাটাস সিম্বল মনে করে। অথচ এর সাথে দাসত্বের কোনো পার্থক্য নেই।

ক্রেডিট কার্ডে ভোগ্যপণ্য কেনা ডিসক্রেডিট

বিভিন্ন উৎসব-পার্বণকে কেন্দ্র করে ক্রেডিট কার্ড কোম্পানিগুলোর থাকে নানা আয়োজন। কোরবানির ঈদে আকর্ষণীয় মূল্যে আর কিস্তিতে অর্থাৎ বাকিতে ফ্রিজ কিনতে প্রলুব্ধ করা হয় ক্রেতাদের। কিন্তু এসবের ফলে কোরবানির পবিত্রতা ও রহমত-বরকত থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন আপনি নিজেই।

আপনি কোরবানি করছেন আল্লাহর নামে। কিন্তু মাংস রাখার জন্যে যখন কিস্তিতে ফ্রিজ কিনছেন, আপনার জীবনে সুদ প্রবেশ করছে। আবার প্রভিডেন্ট ফান্ড থেকে ঋণ নিয়ে কোরবানি করার মানসিকতাও



অনেকের মধ্যে দেখা যায়। সুদের হার কম বা বেশি যা-ই হোক, সুদসহ আসল শোধ করতে হবে-এটাই নিয়ম। তাই ধর্মীয় এই নির্দেশ পালনে সুদ জড়িত থাকায় সহজেই তারা পাপের অংশীদার হচ্ছে। সচেতন হোন-আপনার স্বপ্নের বাড়ি, স্বপ্নের গাড়ির চাবি দেখিয়ে ক্রেডিট কার্ড কোম্পানিগুলোর অন্তহীন প্রচেষ্টার পেছনে কী স্বার্থ লুকিয়ে আছে?

শুধু তা-ই নয়, কিস্তিতে ভোগ্যপণ্য কেনার অসুস্থ প্রতিযোগিতা সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধি করে না; বরং এটা নগদে নিজের উপার্জিত টাকায় কিনতে পারার অযোগ্যতাই প্রকাশ করে। উপার্জন না করে ব্যয় করা যেমন অসম্মানের, বাকিতে কিনে ফুটানি করাও একইরকম হীন কাজ।

ধর্ম কী বলছে?

ক্রেডিট কার্ডের ব্যাপারে ওআইসি (অর্গানাইজেশন অব ইসলামিক কো-অপারেশন)-এর ২০০০ সালের ফতোয়া হলো-যদি ক্রেডিট কার্ডে সুদ আরোপ করার ব্যবস্থা থাকে, সুদ আরোপ হওয়ার আগেই আসল শোধ করে দিলেও এটা অনুমোদনযোগ্য নয়।

সনাতন ধর্মে বলা হয়েছে-ইহলোকে উত্তমর্ণের কাছে সকল ঋণশোধ করার শক্তি দাও। তোমার প্রাসাদে আমায় সকল ঋণ থেকে মুক্ত করো। ঋণ নিমিত্ত নরকপাত থেকে আমায় মুক্ত করো।...

[অর্থর্ববেদ : শ্লোক ১১৭-১৮-১৯]

বাইবেলে ঋণ নিষিদ্ধ ছিল। সেইন্ট অ্যামব্রোস ৩৮০ খ্রিষ্টাব্দে বলেছেন, সুদি ব্যবসা হলো ঋণী ব্যবসা, যা ডাকাতি-এমনকি খুনের সাথে তুলনীয়।

ঋণমুক্ত জীবন ॥ সচ্ছল ও সম্মানের জীবন

২৭ বছর ধরে কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশন মানুষকে সচেতন করে আসছে ঋণ নামক অবিদ্যা সম্পর্কে, ঋণ করার দৃষ্টিভঙ্গি বর্জন করতে। ফাউন্ডেশনের বহুমুখী সেবা কার্যক্রমের নেপথ্যেও রয়েছে এর ঋণমুক্ত প্রাতিষ্ঠানিক অবকাঠামো। ফলে প্রতিটি কাজে সমৃদ্ধি ও বরকতের ছোঁয়া দৃশ্যমান।

আসুন, ঋণ কিস্তি ও ক্রেডিট কার্ডের অভিশাপ থেকে বাঁচতে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করি। গড়ে তুলি সচ্ছল ও সম্মানের জীবন, যা প্রতিটি মানুষের মৌলিক অধিকার।

তথ্যসূত্র : ইউএসএ টুডে, ১৫ আগস্ট ২০১৮
দ্য গার্ডিয়ান, ৩ ডিসেম্বর ২০১৮
ওলফ স্ট্রিট, ৮ নভেম্বর ২০১৬

রিয়াসাত আরেফিন শোভন

সততা, দক্ষতা ও বিনয়ের এক আলোকোজ্জ্বল দৃষ্টান্ত

১৩ সেপ্টেম্বর শুক্রবার। লামার কোয়ান্টামম থেকে দিন কয়েকের জন্যে বাড়ি যাচ্ছেন ৩২ বছরের এক তরুণ। তার যাওয়ার কথা শুনে দৌড়ে এলো ১৪-১৫ বছরের এক কিশোর। বলল, ‘স্যার, আপনি যখন থাকেন না, আমার খুব একা লাগে। মনে হয়, এখানে আমার কোনো অভিভাবক নেই।’ স্নেহে সেই কিশোরের মাথায় হাত বুলিয়ে তিনি বললেন-‘সবসময় আল্লাহকে অভিভাবক মনে করবে। তাহলে আর নিজেকে কখনো একা লাগবে না।’

এই ছিল তাদের কথোপকথন আর কোয়ান্টামম থেকে তার শেষবারের মতো যাত্রা। এই তরুণের নাম রিয়াসাত আরেফিন শোভন। কোয়ান্টাম কসমো স্কুল ও কলেজের হিকমান ক্যাম্পাসের আবাসিক সুপারিনটেন্ডেন্ট। হাই স্কুল আর কলেজ পড়ুয়া কোয়ান্টাদের সাথে তার বয়সের ব্যবধান খুব বেশি না হলেও এ কিশোররা শোভনকে বসিয়েছিল পিতার আসনে।



(৪ আগস্ট ১৯৮৭ - ১৩ সেপ্টেম্বর ২০১৯) কো-অর্গানিয়ার, কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশন। আবাসিক সুপারিনটেন্ডেন্ট, কোয়ান্টাম কসমো হাই স্কুল ও কলেজ

স্নেহ-মমতায় জয় করেছিলেন কোয়ান্টাদের হৃদয়

শোভনের অফিস কক্ষে টেবিলের ওপর একটা বক্সে থাকত বেশ কয়েকটা নেইল কাটার। ছোট-বড় নানান সাইজের। শুধু টেবিলেই নয়, তার পকেটেও থাকত অন্তত দুটো নেইল কাটার। পাহাড় ঘেরা সুবিশাল ক্যাম্পাসে টেবিল-চেয়ারে বসে কাজের সুযোগ খুব কমই মিলত। প্রতিদিনের কর্মমুখর সময়ে হাঁটতে-চলতে তিনি শিক্ষার্থী কোয়ান্টাদের যারই হাত-পায়ের নখ বড় দেখতেন, কাছে বসিয়ে নিজেই নখ কেটে দিতেন। এই আপাত ছোট বিষয়টিও তার নজর এড়াতে না। কয়েক শ কোয়ান্টার সার্বিক যত্নে তিনি ছিলেন এতটাই সচেতন।

হাই স্কুল আর কলেজের শিশুদের দায়িত্ব পাওয়ার আগে তিনি কাজ করতেন প্রাইমারি সেকশনের শিশুদের ক্যাম্পাসে। তাদের দেখভালের কাজও করেছেন একইরকম মমতা আর নিষ্ঠায়। ভোরবেলা শিশুদের ঘুম ভাঙলে যখন হাত-মুখ ধুইয়ে তাদের পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করা হতো, শোভনও যোগ দিতেন সে-কাজে। সূচনা আর শিশুশ্রেণির কোয়ান্টাদের জন্যে রাতে বিছানা ভিজিয়ে ফেলাটা নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা। তবুও অবলীলায় এ শিশুদের কাছে টেনে নিতেন শোভন। নিজে হাতে পরিষ্কার করে দিতেন শিশুদের চোখে জমে থাকা ময়লা।

প্রতিদিন ক্ষুদ্র কোয়ান্টাদের গোসলের সময়টা যেন একটা উৎসব। লাইন ধরে শিশুরা দাঁড়িয়ে আছে আর কয়েকজন মিলে তাদের গোসল করছে। একজন টিউবওয়েল চেপে পানি তুলছে, একজন সাবান মাখাচ্ছে, কেউ পানি ঢালছে, কেউ গা মুছিয়ে দিচ্ছে, কেউ চুলে তেল দিয়ে দিচ্ছে, পোশাক পরাচ্ছে। এখানেও হাসিমুখে কাজ করেছেন শোভন।



কোয়ান্টাদের প্রতি ছিল শোভনের সার্বক্ষণিক মনোযোগ। শিশুরাও খুব ভালবাসত ওদের প্রিয় শোভন স্যারকে।

হিকমান ক্যাম্পাসে শুরু দিকটায় কাজ করত স্বল্পসংখ্যক কর্মীর একটি টিম। অনেকটা শূন্য থেকেই সবকিছু গড়ে নিতে হয়েছে তাদের। এতগুলো শিশুর জন্যে তিন বেলা রান্নার আগে শাকসবজি কাটা-ধোয়ার কাজটা করতে হতো সময়ের সাথে পাল্লা দিয়ে। সকালের নাশতার জন্যে কাজ শুরু করতে হতো ভোরের আলো ফোটার আগেই। শোভন সবার আগে ঘুম থেকে উঠে পড়তেন এবং হাসিমুখে ডেকে দিতেন সহকর্মীদের। সবজি কাটার কাজে সবাই হাত না লাগালে কোয়ান্টারা খাবে কীভাবে?

এমনই ছিলেন শোভন। দায়িত্বটা অন্য কর্মীদের জেনেও কাজের সুযোগ কখনো হাতছাড়া করেন নি তিনি। শুধু তত্ত্বাবধান বা নির্দেশ দেয়া নয়, প্রতিটি কাজে তিনি অংশ নিতেন সবার সাথে।

অন্তর্মুখী কিশোর হয়ে উঠল হাজারো মানুষের আশ্রয়স্থল

শোভন তখন রাজশাহী গভ. ল্যাবরেটরি হাই স্কুলের ছাত্র। প্রতিদিন স্কুলে যাতায়াতের জন্যে মা-বাবা একটি রিকশা ঠিক করে দিলেন। বাবার সহকর্মীর ছেলেও সাথে যাবে, কারণ সে-ও একই স্কুলে পড়ে। এভাবে তিন বছর ধরে যাওয়া-আসা অথচ কোনোদিন সমবয়সী ছেলেটার সাথে কথা বলে নি শোভন। এতটাই চুপচাপ ছিল সে।

এই অন্তর্মুখী কিশোর নানা বয়সী মানুষের সাথে সহজ হতে শুরু করল কোয়ান্টাম মেথড কোর্স করার পর। মায়ের উৎসাহে ২০০৩ সালে রাজশাহীতে অংশ নিল কোর্সের ১৬১ তম ব্যাচে। তখন সে ক্লাস নাইনে পড়ছে। এরপর সাদাকায়নে নিয়মিত অংশগ্রহণ এবং ২০০৬ সাল থেকে সে রাজশাহী সেন্টারের সক্রিয় কোয়ান্টিয়ার।

মাটির ব্যাংক করসেবায় বোঝা যেত-কোমল স্বভাবের মৃদুভাষী এই ছেলেটি সংকল্পে কতটা দৃঢ়! রোদ-বৃষ্টিতে নগরের অলি-গলি ঘুরেও যখন কোনো মাটির ব্যাংক গ্রহীতার বাসা খুঁজে পাওয়া যেত না, অন্যরা হয়তো হাল ছেড়ে দিতেন কিন্তু কোয়ান্টিয়ার শোভন খুঁজে বের করতেনই।

কোয়ান্টাম ইয়োগা টিমে কাজ করেছেন নিয়মিত। খতনা কার্যক্রমের কোয়ান্টিয়ার হিসেবে তার পারদর্শিতা ছিল অপারেশন থিয়েটারে সার্জনকে সহযোগিতা করার ক্ষেত্রে। সূক্ষ্ম পর্যবেক্ষণ ক্ষমতা ছিল শোভনের, ব্রিডিং পয়েন্ট খুঁজে বের করতে পারতেন চোখের নিমেষেই। ফলে অপারেশন-পরবর্তী রক্তক্ষরণ বন্ধ করা সম্ভব হতো দ্রুততার সাথে।

কোয়ান্টামের উদ্যোগে ২০০৫ সালে রাজশাহীতে শুরু হয় বেওয়ারিশ লাশ দাফন ও সংকারের কাজ। অন্যান্য কাজের মতো এখানেও শোভন ছিলেন নির্ভরযোগ্য এক স্বেচ্ছাসেবী।

কোনো অভিযোগ ছিল না, চাওয়া ছিল না, ছিল শুধু কাজ

পড়ালেখায় বরাবরই মেধার স্বাক্ষর রেখেছেন শোভন। রাজশাহী নিউ গভ. ডিগ্রি কলেজ থেকে উচ্চ মাধ্যমিক এবং পরবর্তীতে ইঞ্জিনিয়ারিং সম্পন্ন করেন রুয়েট (রাজশাহী প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়) থেকে। প্রথাগত ক্যারিয়ার-ভাবনার বাইরে এসে পেশা হিসেবে বেছে নেন সেবামর্মী কাজ।

কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশনে যোগদানের সিদ্ধান্ত নিয়ে ঢাকায় এলেন ২০১১ সালে। সে-সময় ফাউন্ডেশনের সর্বস্তরের সদস্যরা চারপাশে সবার কাছে পৌঁছে দিচ্ছেন বিদায় হজের মর্মবাণী সম্বলিত ‘হে মানুষ শোনো’ সিডি ও কণিকা। হজ ক্যাম্পে ও বিমানবন্দরে সকাল থেকে রাত পর্যন্ত হজযাত্রীদের মাঝে এ ক্যাম্পেইনের মধ্য দিয়েই শুরু হলো শোভনের নতুন পথচলা। একটার পর একটা ফ্লাইট, মধ্যবর্তী সময় যত সামান্যই হোক, কণিকা হাতে শোভন ছুটে যেতেন অপেক্ষমাণ যাত্রীদের কাছে। বিরতি বা বিশ্রাম বলে কোনো শব্দই যেন তার অভিধানে নেই।

কোয়ান্টামে পূর্ণ কর্মী হিসেবে কাজ করেছেন আট বছর এবং কোয়ান্টামের হিসেবে এর আগে আরো পাঁচ বছর। বহু মানুষের সংস্পর্শে এসেছেন, সজ্ঞাবদ্ধ কাজে কখনো নেতৃত্ব দিয়েছেন, কখনো অনুসরণ করেছেন নেতৃত্বকে। অনুসরণে ছিলেন অতুলনীয় আর সুদক্ষ ছিলেন টিম পরিচালনায়। শোভন কখনো দুর্ব্যবহার করেছেন বা কাউকে কষ্ট দিয়েছেন-এমন একটি ঘটনারও উল্লেখ কেউ করতে পারেন না।

সবার জন্যেই তিনি ছিলেন নিঃসংকোচে নির্ভর করার মতো একজন মানুষ। কাজের পরিবেশে ভুল ধরিয়ে দেয়া নয়; বরং সহকর্মীর প্রতি সার্বক্ষণিক সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেয়া ছিল তার সহজাত বৈশিষ্ট্য। যে-কোনো সমস্যায় খুঁজে নিতে পারতেন সহজ সমাধানের পথ।

কারো প্রতিই তার কোনো অভিযোগ ছিল না, চাওয়া ছিল না, স্রষ্টায় সমর্পিত এ জীবনে ছিল শুধু কাজ। কাজের পেছনে লেগে থাকার স্বতঃস্ফূর্ত গুণ ছিল শোভনের। শ্রমসাধ্য কায়িক পরিশ্রমে কখনো পিছিয়ে থাকেন নি। লামায় খেদমতায়নের দিনগুলোতে বৈচিত্র্যময় ও চ্যালেঞ্জিং সব কাজে তিনি ছিলেন অগ্রবর্তীদের একজন।

কোয়ান্টাম কসমো স্কুল ও কলেজে বর্ণাঢ্য কর্মমুখর সময়

ছয় শতাধিক কোয়ান্টাম আবাসিক তত্ত্বাবধায়কের দায়িত্ব শোভন পালন করেছেন দক্ষ সেনাপতির মতো। প্রত্যেকের নাম, আইডি নম্বর এবং কে কোন ক্লাসে পড়ে-সব ছিল তার নখদর্পণে। এমনকি সাপ্তাহিক ছুটির দিনগুলোতে যখন দূরন্ত কিশোরের দল পাহাড়-অরণ্যে ছুটে বেড়াচ্ছে, কারো খোঁজ পড়লে শোভন ঠিক বলে দিতে পারতেন কাকে কোথায় পাওয়া যাবে। এমনভাবেই তিনি মিশে গিয়েছিলেন কোয়ান্টামের সাথে।

দেয়াই যে প্রকৃত অর্থে পাওয়া-এই মন্ত্রেই বিশ্বাস করতেন তিনি। তাই-তো হৃদয় উজাড় করে ভালবেসেছেন কোয়ান্টামের। ওরাও সবচেয়ে বেশি নিরাপদ বোধ করত শোভন স্যারের কাছে। ওদের প্রতি কঠোর না হয়ে তিনি শুধরে দিতে চেষ্টা করতেন সবসময়। প্রতিকূল সময়েও সহকর্মীদের বলতেন-‘সন্তান যত দূরন্তই হোক, মা-বাবা কি কখনো তাকে দূরে সরিয়ে দিতে পারে? আমরাই তো এদের মা-বাবা-অভিভাবক। আমাদের ধৈর্য হারালে চলবে না।’



বিশিষ্ট অতিথিরা লামায় এলে পাশে থেকে নীরবে সেবা দিতেন শোভন। এমনই একটি সফরে জাতীয় অধ্যাপক ড. আনিসুজ্জামানের সাথে।



কোয়ান্টাম কসমো স্কুলের এক ভর্তি উৎসবে (সর্বদানে)

একবার সহকর্মীরা পরিকল্পনা করলেন-ইলিশ মাছ কিনে নিজেরা রান্না করে খাবেন। শোভন শুনে বললেন, ‘এখন পর্যন্ত আমরা কোয়ান্টামের ইলিশ মাছ খাওয়াতে পারি না। যা বাচ্চাদের দিতে পারি না, লামায় তা আমি খেতে পারব না।’ অতএব পরিকল্পনার ওখানেই ইতি।

ক্লাসের পড়া আর ব্যস্ত রুটিনের ফাঁকে কখনো দেখা যেত, একঝাঁক কোয়ান্টামি ঘিরে রেখেছে

শোভনকে আর তিনি জিজ্ঞেস করতেন-বড় হয়ে কে কী হতে চাও? কেউ হবে ডাক্তার, কেউ ইঞ্জিনিয়ার, কেউ শিক্ষক, কেউ হবে প্রধানমন্ত্রী, কেউ-বা বলে উঠত-‘আমি বড় হয়ে শোভন স্যার হবো।’ একথা শুনে হেসে উঠতেন শোভন।

গণিতে তুখোড় ছিলেন তিনি। চাইতেন এ বিষয়ে কোয়ান্টামেরও আত্মবিশ্বাসী করে তুলতে। মজার ছলেই গণিতের নানা প্রশ্ন করতেন ওদের। নবম-দশম শ্রেণির গণিত বইয়ের পৃষ্ঠা নম্বর উল্লেখ করে মুখে মুখেই সমাধান বলে দিতেন।

কোয়ান্টামের পড়ালেখা, প্যারেড, খেলাধুলা, শারীরিক-মানসিক যত্নায়ন-সব ক্ষেত্রেই সমন্বয় সাধনের কাজটি করতেন নিখুঁতভাবে। সর্বস্তরের কর্মী আর কোয়ান্টামের-সব মিলেই যেন একটা টিম, যারা কাজ করে যাচ্ছে মানবিক মহাসমাজ নির্মাণের লক্ষ্যকে সামনে রেখে। মেধার কোনো জাত নেই ধর্ম নেই বর্ণ নেই-পৃথিবীতে এ সত্য প্রতিষ্ঠার জন্যেই নিজের সর্বোচ্চ দিয়ে যাচ্ছে প্রত্যেকে। আর এ টিমের অন্যতম ছিলেন শোভন।



কষ্টসহিষ্ণু কাজেও হাস্যোজ্জ্বল শোভন

সজ্ঞাই যার একমাত্র প্রেম

কর্মপ্রাণ রিয়াসাত আরেফিনের জীবনে সজ্ঞাই ছিল একমাত্র প্রেম। সজ্ঞে যোগদানের প্রাক্কালে গুরুজী শহীদ আল বোখারী তাকে বলেছিলেন, ‘ফাউন্ডেশন তো অনেক পরিশ্রমের জায়গা। এখানে আপনার কষ্ট হবে।’ জবাবে শোভন বলেছিলেন-‘আপনি যদি লামায় এত কষ্ট করতে পারেন, আমিও পারব।’

তিনি ছিলেন এমনই দ্বিধাহীন, লক্ষ্যভিত্তিক এক তরুণ। সততা, দক্ষতা আর বিনয়ের এক বিরল মেলবন্ধন ঘটেছিল তার দীপ্যমান ব্যক্তিত্বে। তাকে আলাদা করা যেত অগণিত মানুষের ভিড়ে।

লামার আবাসনে সবসময় একটা ব্যাগ গোছানো থাকত শোভনের। কিছু পোশাক আর আনুষঙ্গিক জিনিসপত্র। কোথায় যাওয়ার পরিকল্পনা করছেন?-জিজ্ঞেস করলে সহাস্যে বলতেন, ‘সজ্ঞের প্রয়োজনে যে-কোনো জায়গায় যেন তৎক্ষণাৎ রওনা হতে পারি। আল্লাহ ডাকলেও যেন সাথে সাথে চলে যেতে পারি।’

স্রষ্টার ইচ্ছায় জীবন নামের অধ্যায়ে ইতি টেনে চলে যেতে হয়েছে শোভনকে। কিন্তু সজ্ঞের মানুষগুলোর জন্যে তিনি দিয়ে গেছেন পূর্ণপ্রাণে বাঁচার মন্ত্র। বিশ্বাসে-কর্মে-দায়িত্বে উজ্জ্বল এ মানুষটি রেখে গেছেন তার আদর্শের আলো, যে আলোয় বহুদূরের পথ পাড়ি দেবে প্রজন্মের পর প্রজন্ম।

গ্রাজুয়েটদের প্রশ্ন



উত্তর দিচ্ছেন গুরুজী

প্রশ্ন : যাতায়াতের সুবিধার জন্যে কোয়াটাঁমের নতুন একটি শাখায় আমাকে যেতে হচ্ছে। আগে যেখানে যেতাম, সেখানে আমি কোর্সের দায়িত্ব পালনসহ নানা কাজের সুযোগ পেতাম। এখন যেখানে সাদাকায়নে যাই, সেখানে আগের মতো ভালো লাগে না। ফাউন্ডেশনের কাজের প্রতি আমার আগ্রহ কমে গেছে। মেহমানের মতো আসি আর যাই। মনে হচ্ছে, আমি অনেক পিছিয়ে যাচ্ছি।

উত্তর : আপনি কোনো সেন্টার শাখা সেল বা প্রি-সেলের নন, আপনি কোয়াটাঁমের। ফাউন্ডেশনের প্রতিটি সেল শাখা সেন্টার আপনার। যেখানে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করবেন, সেখানে নিঃসংকোচে যাবেন। শুধু আগের শাখা-সেলকে জানাবেন-অমুক জায়গায় গেলে আমার জন্যে সুবিধা হয়।

মনে রাখবেন, ফাউন্ডেশনের উদ্দেশ্যই হলো আপনাকে গড়ে তোলা। তাই নির্দিষ্ট একটি জায়গায় নিয়মিত হওয়া এবং সেখানে সজ্জ্বর কাজে অংশ নেয়াটা আপনার এগিয়ে যাওয়ার পথে সহায়ক।

আর কেন আপনি মেহমানের মতো থাকবেন? তিন দিনের বেশি কোথাও মেহমান হিসেবে থাকার সুযোগই নেই। নবীজী (স) অত্যন্ত বাস্তববাদী ছিলেন। তিনি বলেছেন, মেহমানদারি হচ্ছে তিন দিন। চতুর্থ দিন থেকে কেউ মেহমান বলে গণ্য হবে না।

অতএব আপনি সাদাকায়নে প্রথম তিন শুক্রবার মেহমান হতে পারেন। চতুর্থ শুক্রবার থেকে আপনি মেজবান। নতুন জায়গার মোমেন্টারি-আর্ডেন্টারিকে বলবেন, আমাকে কাজ দিন। তারা দিতে না পারলে প্রয়োজনে আমাকে লিখবেন। সবসময় কাজের মধ্যে থাকবেন। কারণ ভালো কাজগুলোই সাথে যাবে, আর কিছু নয়। সজ্জ্বক সংকাজটুকুই পরকালীন সম্বয়। আর কাজের মধ্যে থাকলেই আপনি সব দিক থেকে ভালো থাকবেন।

প্রশ্ন : আমার স্বামী একটি মামলায় জেল খেটেছেন নয় মাস। এখন আরেকটা মামলায় হাইকোর্টের নির্দেশ মোতাবেক আগামী ১৫ দিনের মধ্যে ১৩ লক্ষ টাকা এবং পরের মাসে ব্যাংকে ২০ লক্ষ টাকা ঋণশোধ করতে হবে। এমতাবস্থায় আমার একটি ফ্ল্যাট বিক্রির সিদ্ধান্ত নিই। কিন্তু ফ্ল্যাটটি যেহেতু আমার ভাইয়ের নামে কেনা, সে দাবি করছে ফ্ল্যাট বিক্রি করলে তাকে ৩০ লক্ষ টাকা দিতে হবে। এখন আমরা এমনিতেই মৃত, সে আমাদের আরো মেরে ফেলতে চাচ্ছে। গুরুজী, আমাদের করণীয় কী? দোয়া করবেন।

উত্তর : আমরা আপনার এবং আপনার পরিবারের প্রতি সমবায়ী, কিন্তু আদতে তো এটাই হওয়ার ছিল। কারণ আপনি যখন ভাইয়ের নামে ফ্ল্যাট কিনেছেন, তখন বাস্তবতা হয়তো এই-আপনার অর্ধটা বৈধ কোনো পথে অর্জিত ছিল না। তাই আপনি নিজের নামে ফ্ল্যাটটি কিনতে পারেন নি। ভাইকে আপনি নিরাপদ মনে করেছেন। ভেবেছেন, ভাইয়ের নামে রাখলে কেউ কিছু বুঝবে না। এখন ভাই মনে করছে, ‘যো আপসে আপ আতা হ্যায় সাব হালাল হ্যায়’।

সেই গল্পটা তো জানেন নিশ্চয়ই। এক মওলানা সাহেব ওয়াজ করছেন যে, তিনি গোশত খান না। কিন্তু খেতে বসে দেখলেন, গোশত ছাড়া আর কিছুই নেই। তখন বললেন, ঠিক আছে একটু ঝোল দাও। ঝোল দিতে গিয়ে গোশতের একটি টুকরো পাতে পড়ে গেছে। মেজবান খুব শঙ্কিত হয়ে উঠিয়ে নিতে যাবেন, তখন মওলানা সাহেব তাকে থামিয়ে বললেন, ‘ছোড় দো ছোড় দো, যো আপসে আপ আতা হ্যায় সাব হালাল হ্যায়’। অর্থাৎ আপনা-আপনি যেহেতু এসে পড়েছে, অতএব এটা হালাল।

এখন আপনার ভাইও সেটাই মনে করছে-নিশ্চয়ই দুলাভাই নয়-ছয় করেছে। তা না হলে আমার নামে কেন ফ্ল্যাট রাখবে? অতএব আমি এর সুযোগ তো নিতেই পারি।

একথা বলার উদ্দেশ্য হলো বাস্তবতা তুলে ধরা, কাউকে ছোট করা নয়। এখন আপনার কাজ হবে, যা হয়ে গেছে সেজন্যে তওবা করা। তওবার অর্থ হলো অনুশোচনা ও আল্লাহর কাছে ক্ষমাপ্রার্থনা করা। সেইসাথে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হওয়া যে, এ অন্যায় আমার দ্বারা আর হবে না। ঋণ করে আর ঘি খাব না! আমরা দোয়া করি, যেন আপনারা দ্রুত এ জটিলতা কাটিয়ে উঠতে পারেন।

প্রশ্ন : পোস্ট অফিসে আমার দুই লক্ষ টাকার সম্বয়পত্র আছে। সেখান থেকে প্রতি মাসে আমি দুই হাজার টাকা করে সুদ পাই। কিন্তু মুনাফা হয় বলে আমি পোস্ট অফিসে টাকা রাখতে ইচ্ছুক নই এবং আগামী মাসে আমি টাকাটা তুলে নেয়ার নিয়ত করছি। কিন্তু এই টাকাটা আমার সম্বল। এতদিন ধরে মুনাফার এই টাকায় আমার প্রয়োজনীয় হাতখরচ চলছিল। আমার স্বামী আমাকে কোনো হাতখরচ দেয় না। এমনকি আমার জামা, জুতা, ব্যাগ, মোবাইলের খরচ, মাটির ব্যাংকে দান এবং ফাউন্ডেশনের প্রোগ্রামে যাওয়া-আসাসহ সব ধরনের খরচ আমাকেই বহন করতে হয়। গুরুজী, স্বামীর বিরুদ্ধে নালিশ করছি না। তবে টাকাটা যেহেতু আমার একমাত্র সম্বল, তাই কোনো সং ও বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠানে আমি বিনিয়োগ করতে চাই, যেন দুই লক্ষ টাকা থেকে আমি এটা দুই কোটিতে নিয়ে যেতে পারি। এজন্যে আমার কী করা উচিত?

উত্তর : স্বামী যদি হাতখরচ না দেন, তবে স্বামীর পকেটকে নিজের পার্স মনে করবেন সবসময়। এটা নিয়ে মজার ঘটনা আছে।

মক্কা মুক্ত হওয়ার পর নবীজীর (স) কাছে সবাই বায়াত হতে এসেছে। আবু সুফিয়ানের স্ত্রী হিন্দা দেখল-এটাই সুযোগ! সবাই যাচ্ছে, যদি আমিও গিয়ে তাঁর কাছে বায়াত গ্রহণ করি তাহলে মৃত্যুদণ্ড থেকে বেঁচে যেতে পারি।

কারণ হিন্দা নবীজীর (স) চাচা হামজার (রা) কলিজা চিবিয় খেয়েছিল, যা ছিল ক্ষমার অযোগ্য অপরাধ। মহিলাদের ভীড়ে সে চাদরে মুখ ঢেকে সেখানে উপস্থিত হলো। নবীজী (স) তাকেও বায়াত করছেন এবং বলছেন যে, কখনো মিথ্যা বলবে না, চুরি করবে না ইত্যাদি।

চুরির প্রসঙ্গ আসতেই হিন্দা বলল, আমার স্বামী আবু সুফিয়ান অত্যন্ত কৃপণ। সে যে টাকা দেয় তা আমার ও সন্তানের ভরণপোষণের জন্যে যথেষ্ট নয়। তাকে না জানিয়ে তার পকেট থেকে যদি আমি টাকাপয়সা নিই, তা কি চুরি হবে? এটা কি পাপ হবে? নবীজী (স) বললেন, ‘তোমার প্রয়োজন পূরণের জন্যে পর্যাণ্ড অর্থ স্বামীর পকেট থেকে নিতে পারো।’

অতএব স্বামীর টাকাই আপনার টাকা। তিনি টাকা দেন না বলে কেন আপনি হীনম্মন্যতায় ভুগবেন? এটা তো স্বামীর অন্যায়। কারণ তিনি বিয়ে করেছেন স্ত্রীকে সম্মানজনক ভরণপোষণ দেয়ার শর্তে। তার সামর্থ্যের মধ্যে স্ত্রীকে হাতখরচ দিতে হবে, সেটা যত অল্পই হোক।

আর আপনি নিজের টাকা কোনো সং ও বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠানে বিনিয়োগ করতে চান। কিন্তু এ ধরনের প্রতিষ্ঠান খুঁজে পাওয়া খুবই কঠিন। কখন যে এটা অন্যের টাকা হয়ে যাবে আপনি টেরই পাবেন না!

এখন দেশের কিছু মানুষের অবস্থা এমন যে, টাকা যারই হোক নিজের পকেটে এলে সে ভাবে এটা তারই টাকা। গত ৩০ বছরে ক্ষুদ্রঋণ আমাদের এ অবস্থায় নিয়ে এসেছে। মানুষের নৈতিকতা যা অবশিষ্ট ছিল, তা-ও প্রায় ধ্বংস করে দিয়েছে। এদেশে যিনি সবচেয়ে বেশি ক্ষুদ্রঋণ দিয়েছেন, আমেরিকানরা তাকে কত সম্মান আর পুরস্কার দিচ্ছে! কেন? তাদের ভাষা, আমরা যা করতে পারি নি, তুমি সেই কাজটা করছে-বাঙালির নৈতিকতার বারোটা বাজিয়েছ।

অতএব সবসময় বাস্তববাদী হবেন। অবস্থার প্রেক্ষিতে আপনাকে এগাতে হবে। ঘরে টাকা রাখা নিরাপদ নয়, কিন্তু টাকাটা তো কোথাও রাখতে হবে-ব্যাংকে অথবা পোস্ট অফিসে। আবার টাকা রাখবেন কিন্তু মুনাফা নেবেন না, সেটাও বোকামি। কারণ আপনার লাভের টাকা কোনো খারাপ কাজেও ব্যবহৃত হতে পারে। তাই টাকা যেখানে আছে সেখানেই থাকুক। মাসে দুহাজার টাকা পাচ্ছেন, খুব ভালো।

আরেকটি বিষয়-আপনি দুই লক্ষ টাকাকে উন্নীত করতে চান দুই কোটিতে। বিনাশ্রমে কম সময়ে অনেক লাভ করার এই মানসিকতাই মানুষকে প্রতারণার ফাঁদে ফেলে। তাই অভাববোধ ও প্রয়োজনের মধ্যে পার্থক্য করতে শিখুন।

এ মাসের অটোসাজেশন

দুর্দশাগ্রস্তরা জ্ঞানীর কথা
শোনে না, প্রভাবিত হয়
প্রতারকের অলীক কথায়,
চালবাজের চালবাজিতে আর
শোষকের ভয়ে। দুর্দশা-বঞ্চনার
বৃন্তেই ঘুরপাক খায় তারা।
আমি জ্ঞানীর কথা শুনব। উড়ে
বেড়াব মুক্তির আনন্দলোকে।

ইনভেস্টমেন্ট কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ (আইসিবি)-এ 'শুদ্ধাচার ও মানসিক চাপ উপশম' কর্মশালা



১৯ সেপ্টেম্বর ঢাকায় ইনভেস্টমেন্ট কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ (আইসিবি)-এর প্রধান কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত কর্মশালায় কর্পোরেশনের ব্যবস্থাপনা পরিচালক, উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক এবং সার্বসিভিয়ারি কোম্পানিসমূহের কর্মকর্তাসহ ৯০ জন উপস্থিত ছিলেন।



কোয়ান্টাম মেডিটেশন সোসাইটি লন্ডনের নতুন কার্যালয় উদ্বোধন

১৫ সেপ্টেম্বর একটি বিশেষ সাদাকায়ন অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে কোয়ান্টাম মেডিটেশন সোসাইটি লন্ডন শাখার নতুন অফিসের উদ্বোধন করা হয়েছে। লন্ডন শাখার সকল কার্যক্রম এখন থেকে নিম্নলিখিত ঠিকানায় অনুষ্ঠিত হবে :

33 Princelet Street, London E1 5LP
Tel : +442034322672

পেনসিলভেনিয়াতে কোয়ান্টামের যাত্রা শুরু

৭ সেপ্টেম্বর যুক্তরাষ্ট্রের পেনসিলভেনিয়ার আপার ডার্বিতে শুরু হলো কোয়ান্টামের প্রাতিষ্ঠানিক কার্যক্রম। এখন থেকে প্রতি শনিবার সন্ধ্যা ৭.৩০ মিনিটে এ ঠিকানায় অনুষ্ঠিত হবে সাপ্তাহিক সাদাকায়ন :

211, Barrington Rd,
Upper Darby, PA 19082,
Tel : +17186665998



প্রথম সাদাকায়নে ৪০ জন প্রবাসী বাঙালি অংশ নেন

জার্মানিতে কোয়ান্টাম সভা ও মেডিটেশন সেমিনার

৭ সেপ্টেম্বর জার্মানির মুনস্টার শহরে অনুষ্ঠিত কোয়ান্টাম সভায় ১১ জন প্রবাসী বাঙালি অংশ নিয়েছেন। সেমিনার শেষে অংশগ্রহণকারীদের আল কোরআন বাংলা মর্মবাণী উপহার দেয়া হয়।

এছাড়া কোয়ান্টাম মেডিটেশন সোসাইটি হাইডেলবার্গ শাখা ২৬ মে জার্মানির নর্থ সি সাগরের লান্গেওগ (Langeoog) দ্বীপে মেডিটেশন-বিষয়ক একটি বৈজ্ঞানিক সেমিনার আয়োজন করে। হাউস মিডল্যান্ড কনফারেন্স সেন্টারে অনুষ্ঠিত এ সেমিনারে মোট ১৫ জন অংশগ্রহণ করেন।

প্যারিসে বিশা-ক্লোদ বার্নার্দ হাসপাতালে রক্তদান কর্মসূচি

১ সেপ্টেম্বর কোয়ান্টাম মেডিটেশন সোসাইটি প্যারিসের উদ্যোগে পঞ্চম বারের মতো অনুষ্ঠিত হলো স্বেচ্ছা রক্তদান কর্মসূচি। রক্তদানের এ কার্যক্রমটি অনুষ্ঠিত হয় প্যারিসের বিখ্যাত বিশা-ক্লোদ বার্নার্দ (Bichat-Claude Bernard) হাসপাতালে। এবারের আয়োজনে রক্তদান করেন ২৫ জন রক্তদাতা।

উল্লেখ্য, নিয়মিত রক্তদান কার্যক্রম আয়োজনের প্রেক্ষিতে বিশা-ক্লোদ বার্নার্দ হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ কোয়ান্টাম মেডিটেশন সোসাইটি প্যারিসকে স্বেচ্ছা রক্তদাতা সংগঠন হিসেবে তালিকাভুক্ত করেন।

জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থাপনা একাডেমি (নায়েম) এবং ময়মনসিংহ পুলিশ লাইনসে মেডিটেশন সেমিনার

৩ সেপ্টেম্বর জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থাপনা একাডেমিতে (নায়েম) মেডিটেশন সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়েছে। এতে ১৬০ জন বিসিএস শিক্ষা ক্যাডার অংশ নিয়েছেন।

১২ সেপ্টেম্বর ময়মনসিংহ পুলিশ লাইনসে মেডিটেশন সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। এতে মো. শাহ আবিদ হোসেন, বিপিএম (বার) পুলিশ সুপারসহ ৩২০ জন কর্মকর্তা অংশ নেন।

ভার্চুয়াল ভাইরাস সচেতনতামূলক সেমিনার



নেত্রকোণার দুর্গাপুরে সুসং সরকারি মহাবিদ্যালয়

- মুন্সীগঞ্জে ২৪ আগস্ট পি.টি.আই কলেজে ২০০ জন শিক্ষক ও ২৫ আগস্ট গজারিয়া উপজেলা পরিষদে ৯২ জন প্রধান শিক্ষক অংশ নেন।
- ৩১ আগস্ট বগুড়ার শেরপুরে আনোয়ারা সিরাজ স্কুল এন্ড কলেজে ২২৫ জন শিক্ষার্থী ও ২৭ জন শিক্ষক অংশ নেন।
- ১ সেপ্টেম্বর ঠাকুরগাঁওয়ের কলেজিয়েট স্কুল এন্ড কলেজে আনসার ভিডিপি ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর ৬৪ জন প্রশিক্ষণার্থী অংশ নেন।
- ৪ সেপ্টেম্বর নেত্রকোণায় সরকারি মহিলা কলেজ ও আবু আব্বাস কলেজে অনুষ্ঠিত সেমিনারে যথাক্রমে ২৫৯ জন ও ৩৮৫ জন শিক্ষার্থী অংশ নেয়।
- ৪ সেপ্টেম্বর ঢাকার আজিমপুরে গার্হস্থ্য অর্থনীতি কলেজে ২৪৭ জন শিক্ষক ও শিক্ষার্থী অংশ নেন।
- ৫ সেপ্টেম্বর কুমিল্লায় চান্দিনা মহিলা বিশ্ববিদ্যালয় কলেজে ১৯২ জন শিক্ষার্থী অংশ নেয়।
- ৫ সেপ্টেম্বর সাভারে শেখ হাসিনা যুব উন্নয়ন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের শতাধিক প্রশিক্ষণার্থী অংশ নেন।
- ৭ সেপ্টেম্বর নারায়ণগঞ্জের সোনারগাঁও উপজেলায় হোসেনপুর এস.পি ইউনিয়ন কলেজে দুই শতাধিক শিক্ষার্থী অংশ নেয়।
- ৮ সেপ্টেম্বর ফরিদা বিদ্যায়তন উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ে ৭৫ জন শিক্ষক-শিক্ষার্থী অংশ নেয়।
- ৩ ও ১২ সেপ্টেম্বর রাজারবাগ পুলিশ লাইনস স্কুল ও কলেজে যথাক্রমে চার শতাধিক ও দুই শতাধিক শিক্ষার্থী অংশ নেয়।
- ১৭ সেপ্টেম্বর নেত্রকোণার দুর্গাপুরে সুসং সরকারি মহাবিদ্যালয়ে ৩১৫ জন শিক্ষার্থী এবং ২৯ জন শিক্ষক অংশ নিয়েছেন।

ইবনে সিনা মন সুস্থ তো দেহ সুস্থ



ইবনে সিনা

৯৮০-১০৩৭ খ্রিষ্টাব্দ

‘আমি বর্ণাঢ্য কর্মময় জীবন চাই,
তা যতই সংক্ষিপ্ত হোক’

‘যত আরাম তত ব্যারাম’

‘হঠাৎ জ্বলে ওঠা আলো
দ্রুত নিভে যায়’

- ইবনে সিনার জন্ম উজবেকিস্তানের বোখারায় এবং মৃত্যুবরণ করেন ইরানের হামাদানে।
- মাত্র ১০ বছর বয়সে কোরআনে হাফেজ হন।
- ১৬ বছর বয়সে আত্মস্থ করেছিলেন এরিস্টটলের মেটাফিজিক্স। পরবর্তী দুবছরে চিকিৎসাবিজ্ঞানে দক্ষ হয়ে ওঠেন।
- দ্বাদশ থেকে সপ্তদশ শতাব্দী, এই পাঁচশ বছর তার বই ক্যানন অব মেডিসিন বা আল কানুন ফিত-তিব চিকিৎসাশাস্ত্রে পাঠ্যবই হিসেবে ইউরোপে পড়ানো হয়।
- তিনিই প্রথম এনাটমি, পেডিয়াট্রিক্স এবং গাইনোকোলজির কিছু মৌলিক তত্ত্ব তুলে ধরেন। ব্যাখ্যা করেন চোখের এনাটমি।
- যক্ষ্মারোগ প্রথম শনাক্ত করেন ইবনে সিনা এবং প্রমাণ করেন যে, এটি ছোঁয়াচে। রোগ যে পানি ও মাটি দ্বারা বাহিত হতে পারে, এই ধারণাও তার দেয়া।
- শরীর, মন ও আত্মার যোগসূত্রে যে চিকিৎসাপদ্ধতি অর্থাৎ হলিস্টিক মেডিসিন, এর প্রণেতাও তিনি।
- জীবনের শেষ দিকে তিনি প্রায়ই ধ্যানে নিমগ্ন হতেন অধিবিদ্যা, ধর্মতত্ত্ব ও দর্শনের মৌলিক বিষয় নিয়ে।

গল্প নয়, সত্যি। পারস্যের এক রাজকুমার। তার এক অদ্ভুত রোগ হলো। নিজেকে মানুষ নয়, মনে করত সে একটি গরু! গরুর মতো হাম্বা হাম্বা স্বরে ডাকাডাকিও করত। একপর্যায়ে খাওয়াদাওয়া পুরোপুরি বন্ধ করে দিল। কেঁদে কেঁদে সে আর্জি জানাত, ‘আমাকে মারো, আমাকে জবাই করো, তোমরা আমার গোশত রান্না করে খাও।’ রাজকুমারের এই অবস্থা দেখে রাজা পড়লেন মহাবিপদে। কোন ডাক্তার-হেকিম করবে এ অদ্ভুত রোগের চিকিৎসা?

রাজা সে-সময় পারস্যের প্রখ্যাত চিকিৎসক ইবনে সিনার শরণাপন্ন হলেন এবং পুত্রের জীবন রক্ষার অনুরোধ জানালেন। ইবনে সিনা চিকিৎসার দায়িত্ব নিলেন। বুঝতে পারলেন, এটি মনস্তাত্ত্বিক কোনো জটিলতা। তিনি রোগীর কাছে এক লোক পাঠিয়ে বললেন, ‘রাজকুমারকে গিয়ে আশ্বস্ত করো-তোমাকে জবাই করার জন্যে শিগগিরই কসাই আসবে। তুমি প্রস্তুত থেকে।’

একথা শোনার পর রাজকুমার মহাখুশি। ভাবখানা এমন যে, তার গরু হয়ে জন্মানোটা এবার সার্থক হতে যাচ্ছে! একসময় ইবনে সিনা একটি বড় ধারালো ছুরি হাতে হাজির হলেন। রাজপ্রাসাদে গিয়ে খুঁজতে শুরু করলেন-‘আমার গরুটা কোথায়? আমি এখন তাকে জবাই করব।’ রাজকুমার গরুর মতো হাম্বা শব্দ করে জানান দিল-এই যে, গরু এখানে!

ইবনে সিনার নির্দেশে সবাই তাকে ধরে শোয়াল। রোগীও আনন্দে শুয়ে পড়ল। ইবনে সিনা রাজকুমারের গলায় ছুরি ঠেকিয়ে বললেন যে, ‘নাহ! এই গরুটা খুব হ্যাংলাপাতলা, এর গায়ে তো তেমন গোশতই নেই। জবাই করব না। একে খাওয়াদাওয়া করাও। একটু মোটাতাজা হোক, তাহলে এর গোশত সুস্বাদু হবে।’

রোগীও ভাবল, তা-ই তো! এরপর রোগীকে যে খাবারই দেয়া হয়, তৃপ্তির সাথে সে খেতে শুরু করল। মোটাতাজা তাকে হতেই হবে। নিয়মিত খাবারের পাশাপাশি রোগীর সাথে কাউন্সেলিং শুরু করলেন ইবনে সিনা। ধীরে ধীরে রোগী তার স্বাস্থ্য ফিরে পেল। মানসিক অবস্থার উন্নতি হলো তার। একসময় সুস্থ হয়ে উঠল রাজকুমার। দূর হলো মনস্তাত্ত্বিক জটিলতা।

মনোদৈহিক চিকিৎসার অগ্রপথিক

চিকিৎসাবিজ্ঞানে মনস্তত্ত্বের প্রয়োগ ও প্রমাণ দুটোই প্রথম করেছিলেন ইবনে সিনা। এখন থেকে হাজার বছর আগে চিকিৎসাজগতে তার অমর গ্রন্থ কিতাবুশ শেফা-য় তিনি বলেছেন, ‘মন দেহকে প্রভাবিত করে সবচেয়ে বেশি। মন সুস্থ হলে অর্থাৎ মনের আবর্জনা-ক্ষত-ব্যাধির নিরাময় হলে একজন মানুষ সহজেই সুস্থ হয়ে ওঠে।’

অথচ একশ বছর আগে পাশ্চাত্যের চিকিৎসকেরা ওষুধ বা রাসায়নিক উপাদান ছাড়া কোনোকিছুকেই নিরাময়-সহায়ক হিসেবে গণ্য করতেন না। বর্তমানে বিভিন্ন গবেষণার মাধ্যমে ইবনে সিনার এই তত্ত্বই সত্য বলে প্রমাণিত। আধুনিক চিকিৎসাবিজ্ঞানীরা বলছেন, মানুষের যত ধরনের রোগ হয়, তার ৭০-৭৫ ভাগই মনোদৈহিক অর্থাৎ মন থেকে সৃষ্ট।

ইবনে সিনা তার অভিজ্ঞতা থেকে আরো বলেছেন, ‘সুস্থ মানুষও অসুস্থ হতে পারে, যদি সে মনের দিক থেকে আতঙ্কিত থাকে। আবার অসুস্থ একজন মানুষ শুধু ইচ্ছাশক্তি দ্বারাই পুরোপুরি সুস্থ হতে পারে।’ দেহের ওপর মনের প্রভাব কত বেশি-এ বিষয়ে তার একটি যুগান্তকারী উদাহরণ আছে।

রাস্তার ওপর একটি সরু কাঠের তক্তা বিছিয়ে দিয়ে কাউকে যদি বলা হয়, এর ওপর দিয়ে হেঁটে যাও। অনায়াসে তক্তার ওপর দিয়ে সে হেঁটে যাবে। একই তক্তা যদি খালের ওপর পুল হিসেবে বিছিয়ে দেয়া হয় এবং সেই ব্যক্তিকে তক্তার ওপর দিয়ে হেঁটে যেতে বলা হয়, তাহলে ঘটবে উল্টো ঘটনা। শক্ত-সমর্থ পা দুটি দিয়ে সে আর পুল পার হতে পারবে না। কয়েক কদম চলার পর ধপাস করে পড়ে যাবে। কিন্তু কেন?

কারণ পুলের ওপর দিয়ে পার হওয়ার সময় সে ভাবে, ‘যদি পড়ে যাই!’ আর নিউরোসায়েন্সের মতে, মানুষ যা কল্পনা করে, মস্তিষ্ক সেই বাস্তবতাই তৈরি করে। ঠিক তেমনি পুল থেকে পড়ে যাওয়ার ছবিটা ব্যক্তির মস্তিষ্কে গভীরভাবে গেঁথে যায় এবং তার মনে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। ফলে পা দুটিও স্বাভাবিক শক্তি ও ভারসাম্য হারিয়ে ফেলে এবং সে পড়ে যায়।

ইবনে সিনার এ উদাহরণটি বিশ্বজুড়ে জনপ্রিয় মন নিয়ন্ত্রণের পদ্ধতিগুলোতে যুগ যুগ ধরে ব্যবহৃত হয়ে আসছে। কোয়ান্টাম মেথড কোর্সেও এই উদাহরণটি উল্লেখ করা হচ্ছে ২৭ বছর ধরে।

ইবনে সিনা শুধু চিকিৎসকই ছিলেন না। তিনি একাধারে পদার্থবিজ্ঞানী, গণিতজ্ঞ, কবি, ধর্মতত্ত্ববিদ, জ্যোতির্বিজ্ঞানী ও জ্যোতিষবিজ্ঞানী ছিলেন। তখনকার দিনে জ্ঞানের এমন কোনো শাখা ছিল না, যেখানে তার বিচরণ ছিল না। মেধা ও যোগ্যতার জন্যে খ্যাতি অর্জন করেছিলেন অল্প বয়সেই। অর্থ-প্রতিপত্তির উর্ধ্বে জ্ঞান অর্জনেই প্রাধান্য দিয়েছিলেন তিনি।

জ্ঞানের জন্যে উৎসর্গীকৃত জীবন

তখন তার বয়স মাত্র ১৮ বছর। বোখারার আমিরের গুরুতর এক ব্যাধি হলো। তখনকার অভিজ্ঞ ডাক্তার-হেকিম যারা ছিলেন, সবাই চিকিৎসা করতে ব্যর্থ হলেন। ইবনে সিনা বললেন, ‘আমি চেষ্টা করে দেখি।’ তার চিকিৎসা পেয়ে আমির সুস্থ হলেন এবং খুশি হয়ে বললেন, ‘কী পুরস্কার চাই তোমার?’ এই বলে আমির তার গলার রত্নখচিত মালাটি খুলতে শুরু করলেন ইবনে সিনাকে দেয়ার জন্যে। ইবনে সিনা বলে উঠলেন, ‘আমার একটি চাওয়া আছে। আপনার যে বিশাল লাইব্রেরি আছে, সেখানে আমি পড়াশোনা করার অনুমতি চাই।’ সাথে সাথেই আমির বললেন, ‘আমার লাইব্রেরিতে এখন থেকে তুমি ইচ্ছেমতো প্রবেশ করবে এবং পড়াশোনা করবে।’

জ্ঞানচর্চায় তিনি এতটাই নিবেদিত ছিলেন যে, একবার সূর্যাস্ত থেকে সূর্যোদয়ের মধ্যে একশ পৃষ্ঠার গবেষণা নিবন্ধ লিখে ফেললেন। ঘোড়ার পিঠে বসেও লিখতে পারতেন। একসময় তার জ্ঞানের আলো ছড়িয়ে পড়ল বিশ্বময়, হয়ে উঠলেন আধুনিক চিকিৎসাবিজ্ঞানের জনক। সভ্যতাকে করলেন চিরঋণী।